সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। মাহমুদ সেখানে প্রাসাদ, মসজিদ, গ্রন্থাগার, বাগিচা, জলাধার, খাল এবং আমু দরিয়ার (নদী) উপর বাঁধ নির্মাণ করেন। তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেন যেখানে শিক্ষকদের বেতন ও ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। মাহমুদের আমলে দুজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন অল বিরুনি এবং ফিরদৌসি। অল বিরুনি ছিলেন দর্শন এবং গণিতে পণ্ডিত। ভারতে তিনি পর্যটক হিসাবে আসেন। তাঁর লেখা কিতাব অল-হিন্দ সে সময়ের ভারতের ইতিহাস জানার জন্য জরুরি গ্রন্থ। কবি ফিরদৌসি, শাহনামা কাব্য লিখেছিলেন।

অন্যদিকে মহম্মদ ঘুরি ভারতবর্ষের শাসক হতে চেয়েছিলেন। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে তিনি রাজপুত রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহানকে হারিয়ে দেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরি মারা যান। ঘুরির অন্যতম সঙ্গী কুতুবউদ্দিন আইবক সেই সময়ে দিল্লিতে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলায় তুর্কি অভিযান

আনুমানিক ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের শেষ বা ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলার নদিয়া দখল করেছিলেন। সেই থেকে বাংলায় তুর্কি শাসন শুরু হয়েছিল।

টুকরো কথা

মাত্র আঠারোজন ঘোড়সওয়ার মিলে বাংলা জয়! তা-ও কি হয়?

তুর্কি আক্রমণের প্রায় চল্লিশ বছর পরে ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই সিরাজ বাংলায় এসে বখতিয়ার খলজির অভিযানের কাহিনি শুনেছিলেন। তাঁর লেখা *তবকাত-ই নাসিরি* থেকে জানা যায় যে বখতিয়ার খলজি এবং তাঁর তুর্কি বাহিনী ঘোড়া ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে নদিয়ায় ঢুকেছিলেন। সে সময় বাংলা থেকে উত্তর দিকে তিব্বত পর্যন্ত ঘোড়ার ব্যবসা বেশ চালু ছিল। কাজেই তুর্কিদের নদিয়ায় ঢুকতে দেখে কেউই তাদের আক্রমণকারী ভাবেনি। এই নদিয়া কোথায় ছিল?

হয়তো এই নদিয়া ছিল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী নদীর তীরে, যা আজ নদীর তলায় চলে গেছে। অথবা হয়তো বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নৌদা গ্রামই হলো সেকালের নদিয়া। সে যাই হোক, তুর্কি অভিযানের সময় রাজা লক্ষ্মণ সেন নদিয়ায় ছিলেন।

গল্প আছে যে, বখতিয়ারের সঙ্গে মাত্র সতেরো জন সৈন্য ছিল। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। সেকালে উত্তর ভারত থেকে বাংলায় আসার একাধিক রাস্তা

টুকরো কথা

পরবর্তী খিলাফৎ

প্রথম চারজন খলিফার পরে খলিফা পদটি কয়েকটি রাজবংশের হাতে চলে যায়। যেমন- উম্মাইয়া, আব্বাসিয়া, ফতিমিদ, অটোমান প্রভৃতি। উম্মাইয়া খিলাফৎ (৬৬১-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) গড়ে উঠেছিল সিরিয়ার দমাস্কাসকে কেন্দ্র করে। আব্বাসিয়া খিলাফৎ (৭৫০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ) -এর রাজধানী ছিল বোগদাদ। খলিফা আল হারুন-আল রসিদ আব্বাসিদের মধ্যে বিখ্যাত খলিফা। আব্বাসিয়াদের ক্ষমতা শেষ কয়েক শতকে কমে যায়। তখন মিশরে ফতিমিদ খিলাফৎ (৯০৯-১১৭১ খ্রিস্টাব্দ) -এর শাসক ছিল। এবং ঐ সময় উম্মাইয়ারাও আবার স্পেনে খিলাফৎ প্রতিষ্ঠা করে (৯২৯-১০৩১ খ্রিস্টাব্দ)। অটোমানরাও তাদের খিলাফৎ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৫১৭-১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ)। এই ভাবে খলিফা ও খিলাফতের ধারা চলেছিল।

ছিল। সাধারণত বিহার থেকে বাংলায় আসার সময়ে রাজমহল পাহাড়ের উত্তর দিকের পথ ধরেই আসা হতো। রাজা লক্ষ্মণসেনও ওই পথে তুর্কি আক্রমণ ঠেকানোর জন্য সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন। কিন্তু বখতিয়ার খলজি তাঁর সৈন্যদের অনেকগুলি ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে ঝাড়খণ্ডের দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছিলেন।

তখন দুপুরবেলা, বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন খেতে বসেছিলেন। তুর্কিরা আসছে শুনে তিনি কোনো প্রতিরোধ না করে পূর্ববঙ্গের দিকে চলে যান।

তুর্কিরা বিনা যুদ্ধেই নদিয়া জয় করে। এরপর বখতিয়ার নদিয়া ছেড়ে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। এই শহরকে সমকালীন ঐতিহাসিকরা লখনৌতি বলে উল্লেখ করেছেন।

বখতিয়ার খলজি নিজের নতুন রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন করে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এইসব শাসনকর্তারা ছিলেন তাঁর সেনাপতি। বখতিয়ার খলজি লখনৌতিতে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং সুফি সাধকদের আস্তানা তৈরি করে দেন।

লখনৌতি রাজ্যের সীমানা উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট থেকে রংপুর শহর, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী এবং পশ্চিমে বখতিয়ার খলজি অধিকৃত বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এরপর বখতিয়ার খলজি তিব্বত আক্রমণ করে রাজ্যবিস্তার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজি মারা যান। বাংলায় তুর্কি অভিযানের একটা অধ্যায় শেষ হয়। ঐ একই সময়ে পূর্ববঙ্গে রাজা লক্ষ্মণসেনেরও মৃত্যু ঘটেছিল।

ছবি ২.৩ : মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আঁকা একটি ছবি

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) বঙ্গ নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ____________ (ঐতরেয় আরণ্যক/আইন-ই-আকবরি/অর্থশাস্ত্র) গ্রন্থে।

(খ) প্রাচীন বাংলার সীমানা তৈরি হয়েছিল ____________, ____________ এবং ____________ (ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা/গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু/কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী) নদী দিয়ে।

(গ) সকলোত্তরপথনাথ উপাধি ছিল ____________ (শশাঙ্কের/হর্ষবর্ধনের/ধর্মপালের)।

(ঘ) কৈবর্ত বিদ্রোহের একজন নেতা ছিলেন ____________ (ভীম/রামপাল/প্রথম মহীপাল)।

(ঙ) সেন রাজা ____________ (বিজয়সেনের/বল্লালসেনের/লক্ষ্মণসেনের) আমলে বাংলায় তুর্কি আক্রমণ ঘটে।

(চ) সুলতানি যুগের একজন ঐতিহাসিক ছিলেন ____________ (মহম্মদ ঘুরি/মিনহাজ-ই সিরাজ/ ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি।)

২। 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
বজ্রভূমি	বৌদ্ধ বিহার
লো-টো-মো-চিহ্	আধুনিক চট্টগ্রাম
গঙ্গাইকোণ্ডচোল	বাক্‌পতিরাজ
গৌড়বহো	উত্তর রাঢ়
হরিকেল	অল বিরুনি
কিতাব অল-হিন্দ	প্রথম রাজেন্দ্র

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর লেখো :

(ক) এখনকার পশ্চিমবঙ্গের একটি মানচিত্র দেখো। তাতে আদি-মধ্য যুগের বাংলার কোন কোন নদী দেখতে পাবে?

(খ) শশাঙ্কের আমলে বাংলার আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল তা ভেবে লেখো।

(গ) মাৎস্যন্যায় কী?

(ঘ) খ্রিস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকের আঞ্চলিক রাজ্যগুলি কেমন ভাবে গড়ে উঠেছিল?

(ঙ) সেন রাজাদের আদি নিবাস কোথায় ছিল? কীভাবে তারা বাংলায় শাসন কায়েম করেছিলেন?

(চ) সুলতান মাহমুদ ভারত থেকে লুঠ করা ধনসম্পদ কীভাবে ব্যবহার করেছিলেন?

৪। **বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর লেখো :**

(ক) প্রাচীন বাংলার রাঢ়-সুহ্ম এবং গৌড় অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচয় দাও।

(খ) শশাঙ্কের সঙ্গে বৌদ্ধদের সম্পর্ক কেমন ছিল, সে বিষয়ে তোমার মতামত দাও।

(গ) ত্রিশক্তি সংগ্রাম কাদের মধ্যে হয়েছিল? এই সংগ্রামের মূল কারণ কী ছিল?

(ঘ) ছক ২.১ ভালো করে দেখো। এর থেকে পাল ও সেন শাসনের সংক্ষিপ্ত তুলনা করো।

(ঙ) দক্ষিণ ভারতে চোল শক্তির উত্থানের পটভূমি বিশ্লেষণ করো। কোন কোন অঞ্চল চোল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল?

(চ) ইসলাম ধর্মের প্রচারের আগে আরব দেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ইসলাম ধর্মের প্রচার আরব দেশে কী বদল এনেছিল?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) মনে করো তুমি রাজা শশাঙ্কের আমলের একজন পর্যটক। তুমি তাম্রলিপ্ত থেকে কর্ণসুবর্ণ যাচ্ছ। পথে তুমি কোন কোন অঞ্চল ও নদী দেখতে পাবে? কর্ণসুবর্ণে গিয়েই বা তুমি কী দেখবে ?

(খ) মনে করো দেশে মাৎস্যন্যায় চলছে। তুমি ও তোমার শ্রেণির বন্ধুরা দেশের রাজা নির্বাচন করতে চাও। তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো।

(গ) মনে করো যে তুমি কৈবর্ত নেতা দিব্য। পাল রাজাদের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগুলি কী কী থাকবে? কীভাবেই বা তুমি তোমার বিদ্রোহী সৈন্যদল গঠন ও পরিচালনা করবে তা লেখো।

(ঘ) মনে করো তুমি বাংলায় তুর্কি আক্রমণের দিন দুপুরবেলায় নদিয়া শহরের রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলে। সেই সময় কী দেখলে?

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কয়েকটি ধারা

খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

৩.১ ভারতের অর্থনীতি : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

এই অধ্যায়ে আমরা পড়ব খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকে ভারতের অর্থনীতির কথা। বিশেষ করে ঐ সময়ে দক্ষিণ ভারত এবং পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাংলার অবস্থা কেমন ছিল তা আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকেই উত্তর ভারতের বেশ কিছু জায়গায় ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা দেখা গিয়েছিল। নগরগুলির খারাপ অবস্থা পর্যটকদের চোখে পড়েছিল। পুরোনো বাণিজ্য-পথগুলির গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। তবে নতুন বাণিজ্য পথ বা নতুন শহর গড়ে ওঠেনি তাও নয়। *সুয়ান জাং* থানেশ্বর, কনৌজ ও বারাণসীতে ব্যবসায়িক কাজকর্মের রমরমার উল্লেখ করেছেন। আবার প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবেও স্থানীশ্বর এবং কনৌজ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বন্দর নগরীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বরং নবম শতাব্দী থেকে আরব বণিকদের যাতায়াত বেড়ে যাওয়ায়ও বহির্বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল। গ্রামীণ বাজারে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য শস্য বেচাকেনা অনেকগুণ বেড়েছিল। বিশেষত আখ, তুলো এবং নীলের হাট অনেক অঞ্চলেই শুরু হয়েছিল। এসময়ে উত্তর ভারতে ভালো মানের সোনা বা রুপোর মুদ্রার অভাব ছিল। তবে সমকালীন গ্রন্থগুলিতে বহু ধরনের মুদ্রার নাম পাওয়া গেছে। যদিও সেগুলি কতটা চলত, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

৩.১.১. ভারতের সামন্ত ব্যবস্থা

আঞ্চলিক রাজশক্তিগুলির বাড়-বাড়ন্তের ছাপ সে সময়ের ভারতীয় সমাজ এবং অর্থনীতিতে পড়েছিল। সমাজে এক বিশেষ গোষ্ঠীর ক্ষমতা বেড়ে যায়। সমকালীন লেখকরা *সামন্ত, রাজ, রৌণক*—এসব নামে ঐ গোষ্ঠীর পরিচয় দিয়েছেন। এদের মধ্যে কিছু ছিল উঁচু রাজকর্মচারী। তাদের নগদ বেতন না দিয়ে অনেক সময়ে জমি দেওয়া হতো। সেই জমির রাজস্বই ছিল ঐ কর্মচারীদের আয়।

আবার কিছু অঞ্চলে যুদ্ধে হেরে যাওয়া রাজারাও সেই অঞ্চলের রাজস্ব ভোগ করত। কখনওবা যুদ্ধপটু উপজাতি নেতারা কোনো কোনো অঞ্চলে কর্তৃত্ব করত।

এই গোষ্ঠীগুলির এক জায়গায় মিল ছিল। এরা কেউই পরিশ্রম করে উৎপাদন করত না। অন্যের শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য বা রাজস্ব থেকে নিজেরা জীবিকা চালাত। এই অন্যের শ্রমভোগী গোষ্ঠীর মধ্যেও স্তরভাগ ছিল। কেউ ছিল একটি গ্রামের

প্রধান। কেউ বা কয়েকটি গ্রাম মিলিয়ে একটা অঞ্চলের দখল রাখত। একটি বিরাট অঞ্চলের উপরেও কর্তৃত্ব ছিল কারো কারো। এভাবেই রাজা, গোষ্ঠীর শাসক এবং জনগণকে নিয়ে একটি স্তরভেদ তৈরি হয়েছিল সমাজে। মহাসামন্ত, সামন্তদের মধ্যে সবসময়েই যুদ্ধ-ঝগড়া চলত। সবাই চাইত নিজের ক্ষমতা আরও খানিক বাড়িয়ে নিতে। কখনোবা এরা জোট বেঁধে রাজার বিরুদ্ধেও যুদ্ধে নামত। একসময়ে দখল করা গ্রাম থেকে রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি, গ্রামের শাসন এবং বিচারও করত এই গোষ্ঠী। রাজার ক্ষমতাকেও এরা অনেক সময়ে অস্বীকার করত। এর ফলে রাজশক্তির দুর্বলতা পরিষ্কার হয়ে যায়। সামন্ত নেতাদের দাপটে গ্রামগুলির স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাও নষ্ট হয় (**স্বায়ত্তশাসন নিয়ে আরও জানবে নবম অধ্যায়ে**)।

সেই সমাজের ছবি আঁকলে সেটি হবে এরকম :

দেখো, ত্রিভুজটি নীচের দিকে চওড়া হয়েছে। তার মানে, নীচে অনেক জনগণ, তাদের উপর বেশ কিছু সামন্ত বা মাঝারি শাসক। মাঝারি শাসকদের উপরে অল্প কিছু মহাসামন্ত। আর সবার উপরে রাজা। রাজস্ব ও শাসনের অধিকার এইভাবে স্তরে স্তরে ভাগ হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাকে 'সামন্ত ব্যবস্থা' বলে।

টুকরো কথা

ইউরোপে সামন্ততন্ত্র

খ্রিস্টীয় নবম শতকে পশ্চিম ইউরোপে এক রকম সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখা গিয়েছিল। একে *সামন্ততন্ত্র* বলে। সামন্ত সমাজের কাঠামো ছিল ত্রিভুজের মতো। তার নানা স্তরে ছিলেন রাজা, বিভিন্ন সামন্ত এবং উপসামন্ত। সামন্তপ্রভুদের অধীন নাইটরা লোহার পোশাক পরে, ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত। প্রত্যেক সামন্তপ্রভু বহু দুর্গ তৈরি করেন। সামন্তপ্রভুদের ম্যানর বা খামারে ভূমিদাস বা সার্ফদের খাটিয়ে উৎপাদন করা হতো। এ ছাড়া ছিলেন স্বাধীন চাষী। চাষবাস ছাড়া বাণিজ্যও হতো। গড়ে উঠেছিল নগর। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক ছিল ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের সেরা সময়। এর দেড়শো-দুশো বছর পর থেকে এই ব্যবস্থায় ভাঙন ধরতে থাকে। তবে, ষোড়শ শতকের ইউরোপের পূর্ব ভাগে আবার ভূমিদাস প্রথা কিছু কালের জন্য ফিরে এসেছিল।

৩.১.২ দক্ষিণ ভারতের অর্থনীতি

দক্ষিণ ভারতের রাজশক্তিগুলি বহু মন্দির তৈরি করেছিল। সেগুলি শুধুমাত্র পুজোর জন্যই ব্যবহৃত হতো না। তাঞ্জোর এবং গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমে চোল শাসক রাজরাজ এবং রাজেন্দ্রর সময়ে দুটি অসাধারণ সুন্দর মন্দির তৈরি হয়। মন্দির ঘিরে লোকালয় এবং শিল্পীদের বসবাস গড়ে উঠত। মন্দির কর্তৃপক্ষকে রাজা, ব্যবসায়ী ও অভিজাতরা নিষ্কর জমি দান করতেন। সেই জমির ফসল মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের জীবনযাপনের জন্য লেগে যেত। পুরোহিত, মালাকার, রাঁধুনি, গায়ক, নর্তক-নর্তকী প্রমুখ মন্দির চত্বরে থাকত। চোল রাজ্যের ব্রোঞ্জ হস্তশিল্প খুব বিখ্যাত ছিল। তামিলনাড়ু অঞ্চলে কাবেরী এবং তার শাখানদীগুলি থেকে খাল কেটে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়। ফলে কৃষি উৎপাদন বাড়ে, কোথাও বছরে দু-বার ফসল ফলানোও সম্ভব হয়। যেখানে সেচের সুযোগ কম ছিল, সেখানে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য পুকুর, বিল কাটা হতো। কোথাও কুয়োর ব্যবস্থাও ছিল।

চোল রাজ্যের প্রধান ছিলেন রাজা। তাঁকে মন্ত্রীদের এক পরিষদ সহায়তা করত। রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ বা *মণ্ডলমে* ভাগ করা হয়েছিল। কৃষকদের বসতিকে ঘিরে গড়ে ওঠা গ্রামকে শাসন করত গ্রাম-পরিষদ বা *উর*। এই রকম কয়েকটি গ্রামকে নিয়ে গঠিত হতো *নাড়ু*। উর এবং নাড়ু— এই দুই স্থানীয় সভা স্বায়ত্তশাসন, বিচার এবং রাজস্ব বা কর সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করত। ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মদেয় জমি দেওয়ার ফলে কাবেরী উপত্যকায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে বহু নতুন নতুন গ্রামের পত্তন হয়েছিল। এই নতুন গ্রামগুলিকে তদারকি করার জন্য বয়স্ক মানুষদের নিয়ে তৈরি হতো সভা। তারা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করত। ব্যবসায়ীদের স্বার্থ এবং বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলার জন্য 'নগরম' নামের আরেকটি পরিষদ তৈরি হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতে অবশ্য নবম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতি লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন লেখ থেকে জানা যায় যে চেট্টি বা বণিকরা পণ্য সাজিয়ে যাতায়াত করতেন। বিভিন্ন বণিক সংগঠন বা সমবায়ের কথাও জানা যায়। ঐ সংগঠনগুলি বিভিন্ন মন্দিরকে জমি দান করতেন, সেরকম বর্ণনা দক্ষিণ ভারতে তাম্রলেখগুলিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চোলদের ক্ষমতা বাড়ায় সেখানকার বাণিজ্যের উপর ভারতীয় বণিকদের প্রভাব আস্তে আস্তে বেড়েছিল।

এই সময় রাজারা অনেকেই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন উপাধিতে নিজেদেরকে ভূষিত করতেন। যেমন *মহারাজা-অধিরাজ, ত্রিভুবন-চক্রবর্তীন* এই রকম সব। তবে এঁদের মধ্যে অনেকেই স্থানীয় সামন্ত বা ধনী কৃষক, ব্যবসায়ী এবং

কর সংগ্রহ করা কাকে বলে? এখন কী কী ভাবে কর সংগ্রহ করা হয়?

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিতেন। কৃষক, পশুপালক এবং কারিগরদের উৎপাদন থেকে রাজা ভাগ নিতেন। ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও কর সংগ্রহ করা হতো। সেখান থেকেই রাজার বিলাসবহুল জীবন চলত। সৈন্যবাহিনীর দেখাশোনা, দুর্গ এবং মন্দির বানানোয় সেই অর্থ খরচ করা হতো। তাছাড়া, যুদ্ধের সময় বিজয়ী শক্তির সৈন্যরাও পরাজিত অঞ্চলে যথেষ্ট লুঠপাট চালাত। স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবারগুলোর হাতেই খাজনা সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হতো। খাজনার একাংশ ঐ পরিবারগুলি নিজেদের জন্য রেখে, বাকি অংশ রাজকোষাগারে জমা দিত। কোনো কোনো সময় পরাজিত রাজাদের ক্ষমতা এবং গুরুত্ব বুঝে তাদের অধীনতা স্বীকার করিয়ে নিয়ে জমি-জায়গা দান হিসাবে ফেরত দেওয়া হতো। কৃষিজমির পরিমাণ বাড়ানোর জন্য ব্রাহ্মণদের অনেক সময় জমি দান করা হতো। তারা অনাবাদী জমি এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি তৈরি করতেন। ব্রাহ্মণদের কিছু জমি দেওয়া হতো, যার কর নেওয়া হতো না। এই জমি দানের ব্যবস্থাকে ব্রহ্মদেয় ব্যবস্থা বলা হতো।

রাজারা কেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে জমি দান করতেন বলে মনে হয়?

৩.১.৩ পাল-সেন যুগের বাংলার ধনসম্পদ ও অর্থনীতি

পাল-সেন যুগে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যই ছিল বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি। তবে এই যুগে বাংলার অর্থনীতিতে বাণিজ্যের গুরুত্ব ক্রমশই কমে এসেছিল। ভারতের পশ্চিম দিকের সাগরে আরব বণিকদের দাপটের ফলে বাংলার বণিকরা পিছু হটেছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলার বণিকদের গুরুত্ব কমে যাওয়ায় বাংলার অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হয়ে পড়েছিল। বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে মুদ্রা ব্যবস্থার যোগ ছিল। পাল-সেন যুগের বাংলায় সোনা-রুপোর মুদ্রার ব্যবহার খুব কমে যায়। কড়িই হয়ে উঠেছিল জিনিস কেনা-বেচার প্রধান মাধ্যম।

এই সময়ের কৃষিনির্ভর সমাজে ভূমিদানের অনেক নিদর্শন আছে। পাল যুগে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে রাজারা ভূমিদান করতেন। সেন যুগে অনেক ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হয়েছে। সে আমলের লেখগুলি থেকে জানা যায় যে জমি কেনা-বেচার সময় কৃষককেও তার খবর দিতে হতো। সুতরাং, সমাজে কৃষককে নিতান্ত অবহেলা করা হতো না। তবে জমিতে মূল অধিকার ছিল রাষ্ট্র বা রাজার।

রাজারা উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ (১/৬ ভাগ) কৃষকদের কাছ থেকে কর নিতেন। তাঁরা নিজেদের ভোগের জন্য ফুল, ফল, কাঠও প্রজাদের কাছ থেকে কর হিসাবে আদায় করতেন। বণিকরাও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য রাজাকে কর দিত। এই তিন প্রকার কর ছাড়াও নানা রকমের অতিরিক্ত কর

ছিল। নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রজারা রাজাকে কর দিত। সমগ্র গ্রামের উপরেও কর দিতে হতো গ্রামবাসীদের। এছাড়া হাট এবং খেয়াঘাটের উপরে কর চাপানো হতো।

এই যুগের প্রধান ফসলগুলি ছিল ধান, সরষে এবং নানারকমের ফল যেমন আম, কাঁঠাল, কলা, ডালিম, খেজুর, নারকেল ইত্যাদি। আজকে বাঙালির খাদ্যতলিকায় ডাল একটি প্রধান উপাদান। অথচ, সে যুগের শস্যের মধ্যে ডালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ ছাড়া কার্পাস বা তুলো, পান, সুপুরি, এলাচ, মহুয়া ইত্যদিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। গ্রামের আশে-পাশে ঘন বাঁশবন এবং নানারকম গাছের কথা জানা যায়। সেগুলির কাঠ ছিল এ যুগের অন্যতম প্রধান সম্পদ। নদনদীপূর্ণ বাংলার আরেকটি বড়ো সম্পদ ছিল মাছ।

টুকরো কথা

বাঙালির খাওয়া-দাওয়া

যে-দেশে ধানই হলো প্রধান ফসল সে-দেশে ভাতই যে মানুষের প্রধান খাদ্য হবে তাতে সন্দেহ নেই। গরম ভাতে গাওয়া ঘি, তার সঙ্গে মৌরলা মাছ, নালতে (পাট) শাক, সর-পড়া দুধ আর পাকা কলা দিয়ে খাবারের বর্ণনা আছে প্রাচীন কাব্যে। গরিব লোকের খাদ্যতালিকায় থাকত নানা ধরনের শাক-সবজি। আজ আমরা যে-সব সবজি খাই যেমন বেগুন, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, কাঁকরোল, ডুমুর, কচু ইত্যাদি প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালির খাবারে জায়গা করে নিয়েছে। নদীনালার দেশে রুই, পুঁটি-মৌরলা, শোল, ইলিশ ইত্যাদি মাছ খাওয়ার অভ্যেসও ছিল। সেকালে বাঙালি সমাজের সব লোকে না খেলেও অনেকেই হরিণ, ছাগল, নানা রকমের পাখি ও কচ্ছপের মাংস, কাঁকড়া, শামুক, শুকনো মাছ ইত্যাদি খেত। অনেক পরে মধ্যযুগে পোর্তুগিজদের কাছ থেকে বাঙলার লোকেরা আলু খেতে শিখেছে। ডাল খাওয়ার অভ্যেস হয়তো বাঙালি পেয়েছে উত্তর ভারতের মানুষদের কাছ থেকে। তা ছাড়া আখের গুড়, দুধ এবং তার থেকে তৈরি দই, পায়েস, ক্ষীর প্রভৃতি ছিল বাঙালির প্রতিদিনের খাদ্যবস্তু। আর ছিল বাংলায় উৎপন্ন লবণ। মহুয়া এবং আখ থেকে তৈরি পানীয়ও বাঙালি সমাজে চালু ছিল।

গৃহপালিত এবং বন্য প্রাণীর মধ্যে ছিল গোরু, বলদ, ছাগল, হাঁস, মুরগি, পায়রা, কাক, কোকিল, নানান জলচর পাখি, ঘোড়া, উট, হাতি, বাঘ, বুনো মোষ, বানর, হরিণ, শূকর, সাপ ইত্যাদি। এর মধ্যে ঘোড়া এবং উট বাংলার বাইরে থেকে এসেছিল।

সে যুগের বাংলার প্রধান ফসলগুলির ও পশু-পাখির মধ্যে কোনগুলি আজকের পশ্চিমবঙ্গেও দেখা যায়?

শিল্পদ্রব্যের মধ্যে কার্পাস বস্ত্র ছিল প্রধান সামগ্রী। বাংলার সূক্ষ্ম সুতির কাপড়ের খ্যাতি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। হস্তশিল্পের মধ্যে কাঠ এবং ধাতুর তৈরি দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস, গয়নার কথা জানা যায়। ঘর-বাড়ি, মন্দির, পালকি, গোরুর গাড়ি, নৌকা ইত্যাদি তৈরিতে কাঠের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। তার থেকে বোঝা যায় যে সে যুগে কাষ্ঠশিল্পীরা সমাজে বিশেষ গুরুত্ব পেতেন। শিল্পীরা বিভিন্ন নিগম বা গোষ্ঠীতে সঙ্ঘবদ্ধ ছিলেন।

৩.২ বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

পালযুগ বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময়কাল। আনুমানিক ৮০০-১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ ভাষার গৌড়-বঙ্গীয় রূপ থেকে ধীরে ধীরে প্রাচীন বাংলা ভাষার জন্ম হয়। সেটাই ছিল সাধারণ, নিরক্ষর লোকের ভাষা।

সাহিত্য, ব্যাকরণ, ধর্ম, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র তখনও প্রধানত সংস্কৃত ভাষাতেই লেখা হত। ঐ ভাষা শিক্ষিত, পণ্ডিত এবং সমাজের উঁচু তলার মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যেমন, সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* কাব্য বা চক্রপাণিদত্তের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বইগুলো সংস্কৃত ভাষাতে লেখা।

টুকরো কথা

রামচরিত

কবি সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাজ রামপালের ছেলে মদনপালের শাসনকালে (আনুমানিক ১১৪৩-'৬১খ্রিঃ) রামচরিত কাব্য লিখেছিলেন।

রামচরিতের কাহিনি রামায়ণের গল্প অনুসারে লেখা হয়েছে। এতে কবি একই কথার দু-রকম মানে করেছেন। তিনি একদিকে রামায়ণের রাম এবং অন্যদিকে পালরাজা রামপালের কথা লিখেছেন।

রামায়ণের আদলে লেখা হলেও এই কাব্য শুধুই বাল্মীকি-রামায়ণের পুনরাবৃত্তি নয়। এই কাব্যে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের বাংলার প্রেক্ষাপটে এক ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ প্রচার করা হয়েছে। রামায়ণের ভূগোল আর রামচরিতের ভৌগোলিক বিবরণ এক নয়। রামায়ণের অযোধ্যার বদলে এখানে রামপালের রাজধানী রামাবতীর কথা বলা হয়েছে। রামায়ণের সীতা উদ্ধারের কাহিনির সঙ্গে রামপালের বরেন্দ্রভূমি উদ্ধারের তুলনা করা হয়েছে। রামায়ণে সীতার খোঁজে রামের বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর কথা আছে। এর সঙ্গে তুলনা করে রামচরিতে বলা হয়েছে যে, রামপাল তাঁর রাজ্যে সামন্তদের সমর্থন জোগাড় করার জন্য নানা জায়গায় ঘুরছেন। ঐ সামন্তদের সাহায্যেই রামপাল কৈবর্তদের হাত থেকে তাঁর পিতৃভূমি উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন। অর্থাৎ, সন্ধ্যাকর নন্দী রামায়ণের সীতা এবং পাল শাসকের আমলের বরেন্দ্রভূমিকে এক করে দিয়েছেন। সীতার

টুকরো কথা

চক্রপাণিদত্ত

চক্রপাণিদত্ত ছিলেন পালযুগের একজন নামকরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। তাঁর বাড়ি ছিল সম্ভবত বীরভূম জেলায়। প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী চরক ও সুশ্রুতের রচনার ওপর তিনি টীকা লিখেছিলেন। এ ছাড়া, ভেষজ গাছ-গাছড়া, ওষুধের উপাদান, পথ্য নিয়েও তিনি বই লিখেছিলেন। তাঁর লেখা সেরা বই হলো চিকিৎসা-সংগ্রহ।

রূপবর্ণনার মাধ্যমে বরেন্দ্রভূমি এবং চারপাশের এলাকার নদনদী, ফুলফল, গাছপালা, ফসল, বর্ষাকাল ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে রাম এবং রামপালের গল্প লিখতে গিয়ে রামচরিতের ভাষা জটিল হয়ে পড়েছে। এর ভাষা ছিল সংস্কৃত। এই কাব্য পণ্ডিত ও শিক্ষিত মানুষদের জন্যই লেখা হয়েছিল সাধারণ মানুষের এই কাব্য পড়ার সামর্থ্য ছিল না।

পাল রাজারা ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সম্ভবত ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ ছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। তবে শশাঙ্কের আমলের বৌদ্ধধর্মের থেকে পালযুগের বৌদ্ধধর্ম অনেকটা আলাদা ছিল। পাল যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অন্যান্য দার্শনিক চিন্তাধারা মিলে গিয়ে বজ্রযান বা তন্ত্রযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের জন্ম হয়েছিল। এই মতের নেতাদের বলা হতো সিদ্ধাচার্য। এছাড়া সহজযান ও কালচক্রযান নামে আরো দু-রকমের বৌদ্ধ ধর্মমতের এ সময় জন্ম হয়। সহজযানকে সহজিয়াও বলা হয়।

এই ধর্মীয় ভাবনায় না ছিলো দেবদেবীর স্বীকৃতি, না মন্ত্র-পুজো-আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব। এই মতে বিশ্বাসীরা গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে গভীর যোগাযোগে বিশ্বাস করত। তাঁরা মনে করতেন যে, জ্ঞান মানুষের ভিতরেই থাকে এবং কোনো শাস্ত্রের বই পড়ে তা পাওয়া সম্ভব নয়। পরিষ্কার মন এবং আত্মার উপর খুব জোর দেওয়া হতো। তাঁরা বলতেন যে, আত্মা শুদ্ধ হলে তবেই মানুষ নির্বাণ বা চিরমুক্তি লাভ করতে পারে।

ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামির বাইরে এই মতবাদগুলিতে উদার ধর্মীয় পথের খোঁজ পেয়েছিল সাধারণ মানুষ। তা ছাড়া সিদ্ধাচার্যরা যেমন লুইপাদ, সরহপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ প্রমুখ তাদের মত প্রচার করতেন স্থানীয় ভাষায়। পালযুগের শেষ দিক থেকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা এই ভাষায় *চর্যাপদ* লেখা শুরু করেছিলেন। চর্যাপদের মধ্য দিয়ে তখনকার বাংলার পরিবেশ এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ছবি ফুটে ওঠে। এভাবে তাদের হাত ধরেই আদি বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটেছিল।

টুকরো কথা

চর্যাপদ

চর্যাপদ হলো খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকে লেখা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের কবিতা ও গানের সংকলন। চর্যাপদে যে ভাষা রয়েছে তা হলো আদি বাংলা ভাষার নিদর্শন। আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে এই চর্যাপদ-এর পুঁথি উদ্ধার করেন।

টুকরো কথা

নির্বাণ

বৌদ্ধ ধর্মমতে নির্বাণ (মুক্তি) লাভ করলে বারবার মানুষকে জন্মাতে হয় না।

কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের (খ্রিস্টীয় প্রথম শতক) সমসাময়িক লেখক অশ্বঘোষ বৌদ্ধধর্মে নির্বাণ বা মুক্তি বলতে কী বোঝানো হয় তা খুব সুন্দর একটা উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছিলেন যে, প্রদীপের তেল ফুরিয়ে গেলে যেমন তার শিখা নিভে যায়, জীবনে ক্লেশ বা দুঃখের অবসান হলে চিরতরে মুক্তি বা নির্বাণ মেলে। এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধধর্মের হীনযান শাখার।

মহাযানীদের ধারণা ছিলো যে নির্বাণ এমন একটি অবস্থা যেখানে কোনো কিছুই নেই। পরবর্তী কালে অবশ্য এই ধারণাগুলোতে অনেক রকম পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম শক্তিশালী ছিল। তারা নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকাকেই গুরুত্ব দিত।

পাল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা এবং বিহারে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছিল। পাল যুগের বাংলায় শিক্ষা-দীক্ষায় ব্রাহ্মণদের থেকে বৌদ্ধ প্রভাব অনেক বেশি পড়েছিল। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের লেখা বহু বই আজ হারিয়ে গেছে। তবে তিব্বতি ভাষায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে এদের কিছু-কিছু অস্তিত্ব জানা গেছে।

বৌদ্ধ দার্শনিকদের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল আজকের বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে ছড়িয়ে থাকা বৌদ্ধবিহারগুলি। নালন্দা, ওদন্তপুরী (নালন্দার কাছে), বিক্রমশীল (ভাগলপুরের কাছে), সোমপুরী (রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে), জগদ্দল (উত্তরবঙ্গে), বিক্রমপুরী (ঢাকা জেলা) প্রভৃতি বিহারগুলি ছিল উল্লেখযোগ্য। পালরাজাদের সমর্থনে ও বৌদ্ধ আচার্য এবং ছাত্রদের উৎসাহে এই বিহারগুলিসেকালের শিক্ষা-দীক্ষায় বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। আচার্য ও ছাত্রদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন বাঙালি। আচার্যদের মধ্যে খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে শান্তরক্ষিত, শান্তিদেব, কম্বলপাদ ও শবরীপাদ এবং দশম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ), গোরক্ষনাথ ও কাহ্নপাদ ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধ বিহারগুলির মতো পড়াশোনার কেন্দ্র কি আজকাল দেখা যায়?

টুকরো কথা

নালন্দা

*সম্ভবত গুপ্ত সম্রাটদের আমলে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে আজকের বিহার রাজ্যে **নালন্দা বৌদ্ধবিহার** তৈরি হয়েছিল। কালে কালে সমগ্র এশিয়ায় নালন্দার শিক্ষা-দীক্ষার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। হর্ষবর্ধন এবং পাল রাজাদের আমলে নালন্দা শাসকদের সাহায্য পেয়েছিল। স্থানীয় রাজা এবং জমির মালিকরা তো বটেই, এমনকী সুদূর সুমাত্রা দ্বীপের শাসকও এই মহাবিহারের জন্য সম্পদ দান করেছেন। তা থেকে ছাত্রদের বিনা পয়সায় খাবার, জামাকাপড়, শয্যাদ্রব্য এবং ওষুধপত্র দেওয়া হতো। সুদূর তিব্বত, চিন, কোরিয়া এবং মোঙ্গলিয়া থেকে ছাত্ররা এখানে আসত পড়াশোনার জন্য। তার মধ্যে চিনদেশের ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ তহবিলের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে এই বিহারে শিক্ষালাভ করেছেন। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্ররা এখানে পড়ার সুযোগ পেত। নালন্দার সমৃদ্ধির যুগে দশ হাজার জন আবাসিক ভিক্ষু এখানে থাকত। তার মধ্যে ১,৫০০ জন ছিল শিক্ষক এবং ৮,৫০০ জন ছিল ছাত্র। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এর খ্যাতি বজায় ছিল। ঐ শতকে তুর্কি অভিযানকারীরা বিহার অঞ্চল আক্রমণ করে এই মহাবিহারের ব্যাপক ক্ষতি করেছিল।*

ছবি ৩.১ : নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ, বিহার

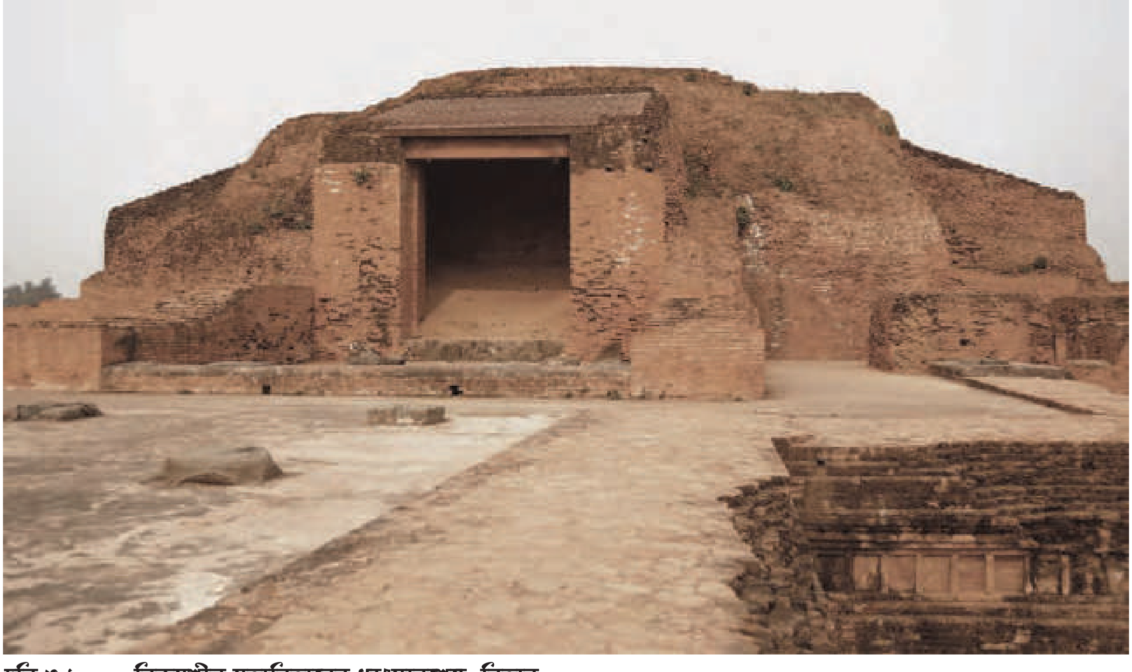

ছবি ৩.২ : বিক্রমশীল মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ, বিহার

তোমার খাতায় একটা শঙ্কু আকৃতির বৌদ্ধ স্তূপের ছবি আঁকো।

টুকরো কথা

বিক্রমশীল

*পাল সম্রাট ধর্মপাল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে মগধের উত্তর ভাগে গঙ্গার তীরে আধুনিক ভাগলপুর শহরের কাছে **বিক্রমশীল মহাবিহার** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তী পাঁচশো বছর এটি টিকে ছিল। এই মহাবিহারে বৌদ্ধ ধর্মচর্চা এবং শিক্ষার জন্য একশোর বেশি আচার্য ছিলেন। সেখানে পড়াশোনার জন্য ছাত্ররা আসত। এখানে ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হতো। সর্বোচ্চ তিন হাজার ছাত্র এখানে পড়ত এবং বিনা খরচে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখানেও প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে ছাত্রদের ভর্তি হতে হতো। শিক্ষা শেষে তাদের উপাধি প্রদান করা হতো। বিক্রমশীল ছিল বজ্রযান বৌদ্ধ মতচর্চার একটা বড়ো কেন্দ্র। এর গ্রন্থাগারে ছিল বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি। দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ) ছিলেন এই মহাবিহারের অন্যতম একজন মহাচার্য। এই মহাবিহারকেও ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি অভিযানকারীরা ধ্বংস করেছিল।*

পালযুগের শিল্পরীতিকে প্রাচ্য শিল্পরীতি বলা হয়। এই রীতির পূর্বসূরি ছিল গুপ্তযুগের শিল্পকলা। পাল আমলের স্থাপত্যের মধ্যে ছিল স্তূপ, বিহার এবং মন্দির। তবে প্রকৃতির কোপে এবং মানুষের রোষে সেই স্থাপত্যের আর বিশেষ কিছু নেই।

প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ এবং জৈনদের মধ্যে স্তূপ নির্মাণের রীতি ছিল। বিশেষ করে বৌদ্ধরা বহু স্তূপ তৈরি করেছিল। এগুলি প্রথমে দেখতে ছিল গোলাকার, পরে অনেকটা মোচার খোলার মতো শঙ্কু আকৃতির হয়ে পড়ে।

পাল রাজত্বে তৈরি স্তূপগুলো শিখরের মতো দেখতে ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের ঢাকা জেলার আসরফপুর গ্রামে, রাজশাহীর পাহাড়পুরে, চট্টগ্রামে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় ভরতপুর গ্রামে বৌদ্ধ স্তূপ পাওয়া গেছে। তবে স্তূপ নির্মাণে বাংলায় কোনো মৌলিক ভাবনার বিকাশ লক্ষ করা যায়নি। বিহারগুলি ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসস্থান এবং বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। পাহাড়পুরে সোমপুরী বিহার ছিল পাল আমলের উল্লেখযোগ্য বিহার। মন্দিরের মধ্যে সোমপুরী বিহারের মন্দির ছিল উল্লেখযোগ্য বিহার। চারকোণা এই মন্দিরে গর্ভগৃহ, প্রদক্ষিণ পথ, মণ্ডপ, সুউচ্চ স্তম্ভ ইত্যাদি ছিল। মন্দির নির্মাণে স্থানীয় পোড়ামাটির ইট এবং কাদার গাঁথুনি ব্যবহার করা হয়েছিল।

ছবি ৩.৩ : বাংলার মূর্তি (খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক)। [(ক) সূর্য (খ্রিঃ ৭ম-৮ম শতক)] [(খ) মঞ্জুবজ্র মণ্ডল (খ্রিঃ ১১শ শতক)] [(গ) চণ্ডী (খ্রিঃ ১১শ শতক)] [(ঘ) মহিষাসুরমর্দিনী (খ্রিঃ ১২শ শতক)] [(ঙ) উমা-মহেশ্বর (খ্রিঃ ১২শ শতক)]

পাল আমলের ভাস্কর্যগুলি ঐ আমলের শিল্পের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পাহাড়পুর প্রত্নক্ষেত্রে এর সবচেয়ে ভালো নির্দশন পাওয়া যায়। এখানে মূল মন্দিরের গায়ে পাথরের ফলক রয়েছে যার মধ্যে স্থানীয় রীতির প্রভাব স্পষ্ট। ফলকগুলিতে রাধা-কৃষ্ণ, যমুনা, বলরাম, শিব, বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি আছে। এই দেব-দেবীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের প্রভাব অনেক বেশি। পাল রাজারা নিজেরা বৌদ্ধ হলেও বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি উভয়ের পৃষ্ঠপোষণা করতেন। ভাস্কর্যের মধ্যে পোড়ামাটির শিল্পসামগ্রীও ছিল। এগুলি ছিল স্থানীয় লোকায়ত শিল্পের প্রতীক। এগুলিতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, সমাজজীবন, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি ফুটে উঠেছে।

খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে আঁকা কোনো ছবি আজ আর পাওয়া যায় না। যে ছবিগুলি পাওয়া গেছে সেগুলো বৌদ্ধধর্মের পাণ্ডুলিপি অলংকরণ করার জন্য আঁকা হয়েছিল। এই ছবিগুলি আকারে ছোটো কিন্তু এগুলি পরের যুগের অণুচিত্রের (মিনিয়েচার) মতো সূক্ষ্ম রেখাময় নয়। বরং এগুলির সঙ্গে প্রাচীরগাত্রে আঁকা ছবির মিল আছে।

ছবি ৩.৪ :
পালযুগে লেখা অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথির একটি পাতার আঁকা ছবি

পাল যুগে খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে বরেন্দ্রভূমির ধীমান এবং তাঁর ছেলে বীটপাল ছিলেন প্রসিদ্ধ শিল্পী। তাঁরা ধাতব শিল্পে, ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্পে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

সেন রাজাদের আমলে স্থানীয় গ্রাম শাসনব্যবস্থায় অবনতি ঘটেছিল। স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগাযোগ শিথিল হয়ে এসেছিল। রাষ্ট্র অসংখ্য ছোটো-ছোটো খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সেন আমলের লেখগুলোতে রাজ্ঞী বা রাজমহিষীদের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ, রাজপরিবারের মহিলাদের গুরুত্ব বেড়েছিল।

সমাজে সাধারণ মানুষের জীবন ছিল মোটামুটি সচ্ছল। তবে ভূমিহীন ব্যক্তি ও শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। এর প্রমাণ আছে সে যুগের সাহিত্যে। পাল আমলের তুলনায় সেন আমলে বর্ণব্যবস্থা কঠোর, অনমনীয় হয়ে পড়েছিল।

পাল যুগের মতো সেন যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রচার এবং প্রসার ঘটেনি। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেই প্রাধান্য দিতেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে বৈদিক ধর্ম ও পৌরাণিক ধর্ম এই দুইয়ের মিশ্রণ ঘটেছিল। ইন্দ্র, অগ্নি, কুবের, সূর্য, বৃহস্পতি, গঙ্গা, যমুনা, মাতৃকা, শিব, বিষ্ণুর পুজো করা হতো। সেন রাজাদের মধ্যে লক্ষ্মণসেন ছিলেন বৈষ্ণব, তবে তার পূর্বসূরিরা ছিলেন শৈব।

বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও বৌদ্ধরা আগেকার যুগের মতো সুযোগ-সুবিধা পেত না। ব্রাহ্মণরাই সমাজপতি হিসাবে সুবিধা ভোগ করত। আবার, ব্রাহ্মণদের মধ্যে একাধিক উপবিভাগ ছিল। অ-ব্রাহ্মণদের সবাইকে ‘সংকর’ বা ‘শূদ্র’ হিসাবে ধরা হতো। ব্রাহ্মণরা অ-ব্রাহ্মণদের কাজ করতে পারত, কিন্তু অব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণদের কাজগুলি করতে পারত না। এ ছাড়া, সেন আমলে আদিবাসী-উপজাতি মানুষদের কথাও জানা যায়।

সেন যুগে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কবি জয়দেব সবচেয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক। তাঁর *গীতগোবিন্দম্* কাব্যের বিষয় ছিলো রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কাহিনি। লক্ষ্মণসেনের রাজসভার আর এক কবি ধোয়ী লিখেছিলেন *পবনদূত* কাব্য। এ যুগের আরো তিনজন কবি ছিলেন গোবর্ধন, উমাপতিধর এবং শরণ। এই পাঁচজন কবি একসঙ্গে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্ন ছিলেন। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় কবি শ্রীধর দাস কর্তৃক সংকলিত *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থে বিভিন্ন কবিদের লেখা কবিতা স্থান পেয়েছে।

সেন যুগের ব্রাহ্মণ্যধর্মী কঠোর অনুশাসনের সঙ্গে সাহিত্যেরও যোগ ছিল। রাজা বল্লালসেন এবং রাজা লক্ষ্মণসেন দুজনেই স্মৃতিশাস্ত্র লিখেছিলেন। বল্লালসেনের লেখা চারটে বইয়ের মধ্যে *দানসাগর* এবং *অদ্ভুতসাগর* বই দুটি পাওয়া গেছে। লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ বৈদিক নিয়ম বিষয়ে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* নামে একটা বই লিখেছিলেন। অভিধানপ্রণেতা সর্বানন্দ এবং গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ শ্রীনিবাস ছিলেন সেন যুগের আরো দুজন লেখক।

টুকরো কথা

সাহিত্য ও সমাজ

সাহিত্য হলো সমাজের আয়না। একদিকে রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কবিদের সংস্কৃত ভাষায় লেখা কাব্যে ধনী ও বিলাসী জীবনের ছবি ফুটে উঠেছিল। রাজা লক্ষ্মণসেনকে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করে কবিরা স্তুতি করেছেন। আবার, গ্রামের সম্পন্ন কৃষকের জীবনযাত্রার ছবি ফুটেছে এই রকম একটি রচনায় : বর্ষার জল পেয়ে চমৎকার ধান গজিয়েছে, গোরুগুলো ঘরে ফিরে এসেছে, খেতে ভালো আখ হয়েছে, আর কোনো ভাবনা নেই।

অন্যদিকে, গরিব মানুষের জীবনেরও ছায়া পড়েছে সমসাময়িক সাহিত্যে। খিদেয় কাতর শিশু, গরিব লোকের ভাঙা কলসি, ছেঁড়া কাপড় এই সব দৃশ্য ব্যবহার করেছেন কবিরা। বৃষ্টিবহুল বাংলাদেশের কুঁড়েঘরের বাসিন্দা গরিব মানুষের জীবনের কষ্ট ধরা পড়েছে এই রকম একটি লেখায় : কাঠের খুঁটি নড়ছে, মাটির দেয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় উড়ে যাচ্ছে, কেঁচো খুঁজতে আসা ব্যাঙে আমার ভাঙা ঘর ভরে গেছে। চর্যাপদের একটি কবিতায় আছে— 'হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্য উপবাস'। এটাই চরম দারিদ্র্যের নিদর্শন।

টুকরো কথা

ডাক ও খনার বচন

প্রাচীন বাংলার সমাজে কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকা। ডাক ও খনার বচন-এর ছড়াগুলো তারই প্রমাণ। সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এই বচন বা ছড়াগুলি চলত। কোন ঋতুতে কী ফসল বুনতে হবে, কোন ফসলের জন্য কেমন মাটি দরকার, কতটা বৃষ্টির দরকার— এসব নানা কিছুর হদিস এই ছড়াগুলিতে আছে। যেমন :

ক) মেঘ করে রাত্রে আর দিনে হয় জল। তবে জেনো মাঠে যাওয়াই বিফল।

খ) খনা ডেকে ব'লে যান। রোদে ধান ছায়ায় পান।

গ) খনা বলে চাষার পো (ছেলে)। শরতের শেষে সরিষা রো।

ঘ) দিনে রোদ রাতে জল। তাতে বাড়ে ধানের বল।

ঙ) অগ্রহায়ণে যদি না হয় বৃষ্টি। তবে না হয় কাঁটালের সৃষ্টি।

এমন আরো অনেক বচন আছে। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় এগুলো লেখা। তারা এই ছড়াগুলো থেকেই নানা দরকারি জ্ঞান পেত।

এবারে বাংলায় পাল এবং সেন শাসনকালের সংক্ষেপে তুলনা করা যেতে পারে। চারশো বছরেরও বেশি স্থায়ী পাল শাসন বাংলার সমাজে যেভাবে শেকড় গেড়েছিল, একশো বছরের কিছু বেশি সময় স্থায়ী সেন শাসন তা পারেনি। গোপাল যখন রাজা হয়েছিলেন তখন তাঁর পিছনে জনসমর্থন ছিল। বিজয়সেন এমন কোনো জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসেননি। পাল শাসকরা যেভাবে বাংলার সমাজে নিজেদের শাসনকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পেরেছিলেন, সেন শাসকরা তা পারেননি। শিক্ষা-দীক্ষায়, ধর্মচর্চায়, শিল্পকলায় পাল যুগ অনেক এগিয়ে ছিল।

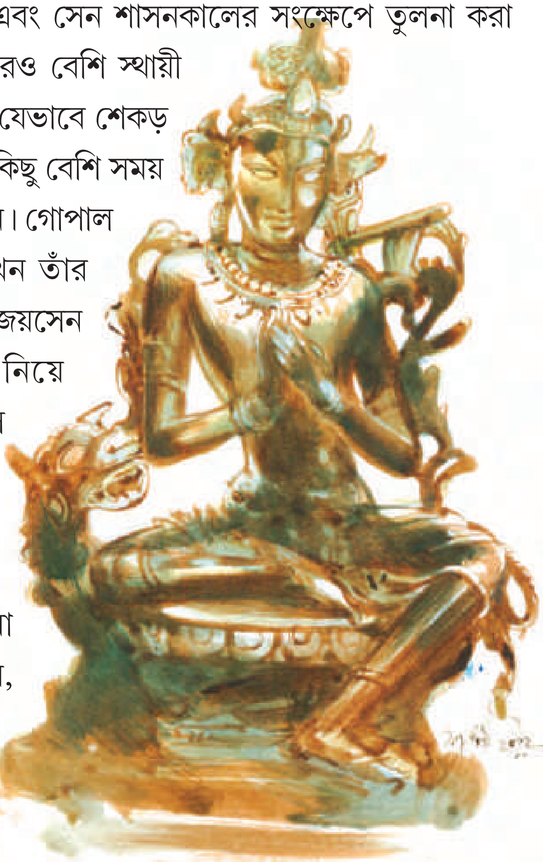

সেন যুগের সাহিত্য থেকে সেই সময়ের বাংলার যে দুরকম ছবি পাওয়া গেছে, এর থেকে সেযুগের সমাজ কেমন ছিল বলে তোমার মনে হয়?

ছবি ৩.৫ :
পালযুগের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি অবলম্বনে আঁকা ছবি

৩.৩ ভারত ও বহির্বিশ্ব : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে বহু বিচিত্র সংস্কৃতির লেনদেন এবং সংঘাত দেখা যায়। আবার ভারতীয় সংস্কৃতির বহু নমুনা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, তিব্বত এবং চিন প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া যায়। বোঝা যায় নানারকম সংস্কৃতির মেলামেশায় ভারতের বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন গড়ে উঠেছিল। সেই জীবনযাপন স্থির ছিল না, প্রয়োজনে নিজেকে বদল করেছিল। ফলে আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নানান বৈচিত্র্যময় স্থানীয় মানুষদের দেখতে পাবে। এই বৈচিত্র্যগুলি ভালোভাবে বুঝে সেগুলি টিকিয়ে রাখা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

ইসলামীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষে আসার ফলে ভারতের জ্ঞানচর্চার লাভ হয়েছিল বেশি। দুই সংস্কৃতির মেলামেশার ছাপ পড়েছিল সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়। ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, সংগীত, চিত্রকলা প্রভৃতি থেকে প্রশাসনিক ধ্যান-ধারণা ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। এই বোঝাপড়া একমুখী ছিল না। উভয় উভয়কেই প্রভাবিত করেছিল। কখনো কখনো সংঘাতও বেঁধেছিল। তবে অনেকদিনের মেলামেশায় আস্তে আস্তে মিশে যায় দুটি ধারাই।

ছবি ৩.৬ : তিব্বতের একটি বৌদ্ধ গুম্ফায় আঁকা দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ)-এর প্রতিকৃতি (আনুমানিক ১১০০খ্রিঃ)। বাঁহাতে একটি তালপাতার পুঁথি ধরে অতীশ তাঁর ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।

টুকরো কথা

দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ)

ভারত এবং বহির্ভারতের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার অন্যতম উদাহরণ হলেন দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ)। বাঙালি বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অতীশের (আনুমানিক ৯৮০-১০৫৩ খ্রিঃ) জন্ম বঙ্গাল অঞ্চলের বিক্রমণিপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে। তিনি ব্রাহ্মণ্য মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না বলে তাঁর বাড়ি আজও 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' নামে পরিচিত। ওদন্তপুরী বিহারে আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান নামে পরিচিত হন। তিনি সম্ভবত বিক্রমশীল, ওদন্তপুরী এবং সোমপুরী মহাবিহারের আচার্য ও অধ্যক্ষ ছিলেন। তিব্বতের রাজা জ্ঞানপ্রভের

অনুরোধে তিনি দুর্গম হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে যান (১০৪০ খ্রিস্টাব্দ)। সেখানে তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তাঁরই চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হয়। তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ভোট ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর মূল সংস্কৃত লেখাগুলি না পাওয়া গেলেও তিব্বতি ভাষায় অনুবাদগুলি পাওয়া যায়। অতীশ তিব্বতে বুদ্ধের অবতার হিসাবে পূজিত হন। তিব্বতের রাজধানী লাসার কাছে তাঁর সমাধিস্থান পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। সমগ্র বাংলা-বিহারের ওপর তাঁর গভীর প্রভাব ছিল। তাই এদেশের বৌদ্ধ আচার্যরা মনে করেছিলেন যে তিনি তিব্বতে চলে গেলে ভারতবর্ষ অন্ধকার হয়ে যাবে। অনেক পরে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই অসীম প্রতিভাধর আচার্য সম্পর্কে লিখেছেন 'বাঙালি অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর, জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালি দীপঙ্কর'।

এই সময়ে ভারতীয় শিল্প, ভাষা এবং সাহিত্যের চর্চা ছড়িয়ে পড়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে বাণিজ্য এবং ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। কম্বোডিয়ায় রামায়ণের ঘটনাবলি নিয়ে নৃত্য-সংগীত খুবই জনপ্রিয় ছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ইন্দোনেশিয়ার বোরোবোদুরের বৌদ্ধ মন্দির সম্ভবত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল। দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে কম্বোডিয়ার আঙ্কোরভাটে বিখ্যাত বিষ্ণু মন্দির তৈরি হয়। পরে এখানে বৌদ্ধরাও উপাসনা করত। এই মন্দিরের গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন গল্প গাথা খোদাই করা হয়েছে। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে ভারতবর্ষের সম্পর্ক একমুখী ছিল, সেটা ভাবা উচিত নয়। পানপাতা ও অন্যান্য বেশ কিছু ফসল কীভাবে ফলাতে হয় তা এইসব প্রতিবেশী দেশগুলির থেকে ভারত শিখেছিল। এই সব দেশগুলির শিল্প, ধর্ম, লিপি এবং ভাষার ক্ষেত্রে ভারতের অনেক প্রভাব ছিল। কিন্তু সেখানকার সমাজ-সংস্কৃতি তার নিজস্ব মেজাজ বজায় রেখেছিল। তার মধ্যে স্থানীয় উপাদানের সাথে ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির ছোঁয়াও লেগেছিল।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। নীচের নামগুলির মধ্যে কোনটি বাকিগুলির সঙ্গে মিলছে না তার তলায় দাগ দাও:

(ক) নাড়ু, চোল, উর, নগরম।

(খ) ওদন্তপুরী, বিক্রমশীল, নালন্দা, জগদ্দল, লখনৌতি।

(গ) জয়দেব, ধীমান, বীটপাল, সন্ধ্যাকর নন্দী, চক্রপাণিদত্ত।

(ঘ) লুইপাদ, অশ্বঘোষ, সরহপাদ, কাহ্নপাদ।

২। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে তার নীচের কোন ব্যাখ্যাটি তোমার সবচেয়ে মানানসই বলে মনে হয়?

(ক) বিবৃতি : বাংলার অর্থনীতি পাল-সেন যুগে কৃষি নির্ভর হয়ে পড়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : পাল-সেন যুগে বাংলার মাটি আগের যুগের থেকে বেশি উর্বর হয়ে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যা-২ : পাল-সেন যুগে ভারতের পশ্চিম দিকের সাগরে আরব বণিকদের দাপট বেড়ে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যা-৩ : পাল-সেন যুগে রাজারা কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের উপর কর নিতেন।

(খ) বিবৃতি : দক্ষিণ ভারতে মন্দির ঘিরে লোকালয় ও বসবাস তৈরি হয়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : রাজা ও অভিজাতরা মন্দিরকে নিষ্কর জমি দান করতেন।

ব্যাখ্যা-২ : নদী থেকে খাল কেটে সেচব্যবস্থার উন্নতি করা হয়েছিল।

ব্যাখ্যা-৩ : দক্ষিণ ভারতে রাজারা অনেক মন্দির তৈরি করেছিলেন।

(গ) বিবৃতি : সেন যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার কমে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : সেন রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন।

ব্যাখ্যা-২ : সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেই প্রাধান্য দিতেন।

ব্যাখ্যা-৩ : সমাজে শূদ্রদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল।

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) দক্ষিণ ভারতে খ্রিস্টীয় নবম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতি কেন ঘটেছিল?

(খ) পাল ও সেন যুগে বাংলায় কী কী ফসল উৎপন্ন হতো? সেই ফসলগুলির কোন কোনটি এখনও চাষ করা হয়?

(গ) রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভার সাহিত্যচর্চার পরিচয় দাও।

(ঘ) পাল শাসনের তুলনায় সেন শাসন কেন বাংলায় কম দিন স্থায়ী হয়েছিল?

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর লেখো :

(ক) ভারতের সামন্ত ব্যবস্থার ছবি আঁকতে গেলে কেন তা একখানা ত্রিভুজের মতো দেখায়? এই ব্যবস্থায় সামন্তরা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করত?

(খ) পাল ও সেন যুগের বাংলার বাণিজ্য ও কৃষির মধ্যে তুলনা করো।

(গ) পাল আমলের বাংলার শিল্প ও স্থাপত্যের কী পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখো।

(ঘ) পাল ও সেন যুগে সমাজ ও ধর্মের পরিচয় দাও।

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) যদি তুমি খ্রিস্টীয় দশম শতকের বাংলার একজন কৃষক হও, তাহলে তোমার সারাদিন কেমন ভাবে কাটবে তা লেখো।

(খ) মনে করো তুমি বিক্রমশীল মহাবিহারের একজন ছাত্র। তোমার শিক্ষক দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ) তিব্বতে চলে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে তুমি কী কথা বলবে? তিনিই বা তোমাকে কী বলবেন? এই নিয়ে একটি কাল্পনিক কথোপকথন লেখো।

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

দিল্লি সুলতানি

তুর্কো-আফগান শাসন

৪.১ সুলতান কে?

মহম্মদ ঘুরি মারা গেলে (১২০৬ খ্রিঃ) তাঁর জয় করা অঞ্চলগুলি ভাগ হয়ে যায় তার চারজন অনুচরের মধ্যে। তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ পেলেন গজনির অধিকার। নাসিরউদ্দিন কুবাচা মুলতান ও উচ্-এর শাসক হয়ে বসলেন। বখতিয়ার খলজি বাংলাদেশের শাসক হন। আর লাহোর ও দিল্লির অধিকার থাকে কুতুবউদ্দিন আইবকের হাতে।

দিল্লিকে কেন্দ্র করে আইবক সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। *সুলতান* একটা উপাধি। তুর্কি শাসকরা অনেকেই ঐ উপাধি ব্যবহার করতেন। আদতে আরবি ভাষায় সুলতান শব্দের মানে কর্তৃত্ব, ক্ষমতা এইসব। যে অঞ্চলের মধ্যে সুলতানের কর্তৃত্ব চলত, তাকে বলা হয় *সুলতানৎ* বা সুলতানি। দিল্লিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে সুলতানদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বজায় ছিল। তাই তার নাম দিল্লি সুলতানি বা *সুলতানৎ*।

৪.২ খলিফা ও সুলতানের সম্পর্ক

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর থেকে ইসলামীয় জগতে প্রধান শাসক ছিলেন খলিফা। ইসলামের আওতায় যত অঞ্চল ছিল, তার মূল শাসক তিনিই। খলিফা আবার ধর্মগুরুও বটে। (এ বিষয়ে তোমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২০নং পৃষ্ঠাতে পড়েছো) ফলে, দিল্লির সুলতানির উপরেও আদতে খলিফারই অধিকার ছিল।

ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের কর্তৃত্ব ছিল বিশাল অঞ্চলে। একজন খলিফার পক্ষে সমস্ত অঞ্চলে শাসন করা সম্ভবই ছিল না। তাই খলিফার থেকে অনুমোদন নিয়ে নানান অঞ্চলে নানান ব্যক্তি শাসন করতেন। তেমনই ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্তানে শাসক ছিলেন সুলতান। কিন্তু, এমনিতে সুলতানরা খলিফাকে যে খুব মেনে চলতেন, তা নয়। তবে মাঝেমধ্যেই কে সুলতান হবেন, এই নিয়ে গোলমাল পাকিয়ে উঠত। ধরা যাক, কোনো তুর্কি সেনাপতি অনেক অঞ্চল জয় করেছেন। সেই অঞ্চলটি তিনি নিজেই শাসন করতে চান। তখন ঐ সেনাপতি খলিফার কাছে উপহার পাঠিয়ে সুলতান হওয়ার আরজি জানাতেন। তার মানে খলিফার অনুমোদনের অত্যন্ত সম্মান ছিল। সেই অনুমোদনকে বাকিরা নাকচ করতে পারত না। তেমনই একটি গোলমাল

টুকরো কথা

শাসকের উপাধি

রাজা, সম্রাট, সুলতান এইসব শব্দগুলিই শাসকের উপাধি। শাসকের ধর্ম ও দেশ এবং শাসনের ক্ষমতার হেরফেরে উপাধিগুলির ব্যবহার বদলে যেত। যেমন, রাজা হলেন রাজ্যের শাসক। রাজা কথাটা সংস্কৃত থেকে এসেছে। তাই ভারতবর্ষে অ-মুসলমান শাসকদের রাজা বলা হতো। আবার যে রাজা অনেক রাজ্য জয় করে বিরাট অঞ্চলের শাসক হয়েছেন, তিনি সম্রাট। সাম্রাজ্যের শাসক তিনি। সাম্রাজ্য একটি বিরাট অঞ্চল। তার সব দেখভাল সম্রাটের দায়িত্ব। একটি সাম্রাজ্যের ভেতরে রাজ্য থাকতেও পারে। রাজা সম্রাটের চেয়ে সম্মান ও ক্ষমতায় ছোটো।

সুলতানরা ছিলেন তুর্কি। সেজন্যই রাজা বা সম্রাট উপাধি না নিয়ে, সুলতান উপাধি নিলেন। তাই কুতুবউদ্দিন আইবককে সুলতান বলা হয়।

পাকিয়ে উঠল দিল্লির সুলতানিতেও। তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ গজনির শাসক হিসাবে দিল্লির উপরেও অধিকার কায়েম করতে চাইলেন। কুতুবউদ্দিন তাতে রাজি হলেন না। গজনির সঙ্গে দিল্লির সব সম্পর্ক বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু, কুতুবউদ্দিনের জামাই ইলতুৎমিশ যখন সুলতান হলেন (**৪.৩ একক দেখো**), তখনই গোলমাল জটিল হয়ে উঠল। একে তো ইলতুৎমিশ কুতুবউদ্দিনের জামাই, ছেলে নন। তার উপরে, নাসিরউদ্দিন কুবাচা মুলতান থেকে এসে লাহোর ও পাঞ্জাবের খানিক অংশ দখল করে নিলেন। অন্যান্য অঞ্চলেও ক্ষমতাবান তুর্কিরা (*আমির* বলা হতো এদের) কর্তৃত্ব করতে লাগলেন। ফলে ইলতুৎমিশ পড়লেন বিপদে। কেউই তাঁকে দিল্লির সুলতান বলে মানতে চায় না। তারা তার অধিকার নিয়েও প্রশ্ন তোলে।

তখন ইলতুৎমিশ দিল্লির সুলতানিতে নিজের অধিকার বজায় রাখতে খলিফার অনুমোদন প্রার্থনা করেন। খলিফার কাছে নানান উপহার পাঠান। তার বদলে বাগদাদের খলিফা ইলতুৎমিশকে *দুরবাশ* ও *খিলাত* পাঠান, এবং দিল্লির সুলতানিতে ইলতুৎমিশের কর্তৃত্বকে অনুমোদন দেন।

টুকরো কথা

খলিফার অনুমোদন

ইলতুৎমিশ খলিফার থেকে অনুমোদন পান ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে। সুলতানরা তাঁদের মুদ্রায় নিজেদের 'খলিফার প্রতিনিধি' বলে খোদাই করাতেন। প্রতি শুক্রবারে নামাজে খলিফার নাম বলতেন। মহম্মদ বিন তুঘলক প্রথমে তাঁর আমলের মুদ্রায় খলিফার নাম খোদাই করা বন্ধ করে দেন। তবে পরে ঘন ঘন বিদ্রোহে জেরবার হয়ে তিনি আবার নিজের মুদ্রায় খলিফার নাম খোদাই করার আদেশ দেন। খলিফার থেকে অনুমোদন পত্রও আনিয়ে নেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলকও দু-বার খলিফার অনুমোদন পান। এরপর থেকে অবশ্য ভারতে খলিফার থেকে অনুমোদন চাওয়ার প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। আর মুঘল বাদশাহরা ভারতের বাইরের কাউকে মর্যাদা ও ক্ষমতায় নিজেদের সমান বলে মনেই করতেন না।

এভাবে যখনই শাসন ও অধিকারের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠত, তখনই দিল্লির সুলতানরা খলিফার আনুগত্য স্বীকার করে তার অনুমোদন চাইতেন। তবে, কাজের দিক থেকে দিল্লির সুলতানরা প্রায় চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। খলিফারা কেউই দূর হিন্দুস্তানের ব্যাপারে নাক গলাতেন না। এভাবেই দিল্লির সুলতানি নিজের মতো করে ভারতবর্ষে বা হিন্দুস্তানে প্রায় তিনশো কুড়ি বছর শাসন জারি রাখতে পেরেছিল।

টুকরো কথা

খুতবা

খুতবা কথাটির আসল মানে হল ভাষণ। কোনো সুলতানের শাসনকালে মসজিদের ইমাম একটি ভাষণ পড়তেন। শুক্রবারের দুপুরের নামাজের (জোহরের নামাজ) পরে সবার সামনে ঐ ভাষণ বা খুতবাটি পাঠ করা হতো। তাতে সমকালীন খলিফা ও সুলতানের নামের উল্লেখ থাকত। এর মধ্যে দিয়ে সুলতান যে নিয়ম মেনে শাসক হয়েছেন সেটা বারবার জানান দেওয়া হতো।

কথার মানে

আমির : *উঁচু বংশে জন্ম, বড়োলোক ব্যক্তি। তবে দিল্লির সুলতানির ইতিহাসে শাসনকাজে নিযুক্ত, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমির বলা হতো। আমির শব্দেরই বহুবচন হলো ওমরাহ (আমিরগণ)।*

দুরবাশ : *স্বাধীন শাসনের প্রতীক দণ্ড।*

খিলাত : *আনুষ্ঠানিক পোশাক।*

৪.৩ দিল্লি সুলতানি : খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগ

কুতুবউদ্দিন আইবকের (১২০৬-'১০ খ্রিঃ) সময়ে দিল্লিতে তুর্কি শাসন স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে শুরু করে। মামেলুক (দাস বংশ) সুলতানরা ছিলেন ইলবারি তুর্কি। ইলতুৎমিশের (১২১১-'৩৬ খ্রিঃ) সময়ে দিল্লি সুলতানির সামনে প্রধান তিনটি সমস্যা ছিল। প্রথমত, কীভাবে সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহী শক্তিকে দমন করা যাবে? দ্বিতীয়ত, কীভাবে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ মোঙ্গল শক্তিকে মোকাবিলা করা যাবে? এবং তৃতীয়ত, কীভাবে সুলতানিতে একটি রাজবংশ তৈরি করা যাবে, যাতে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর উত্তরাধিকারী গোলমাল ছাড়াই সিংহাসনে বসতে পারে? ইলতুৎমিশ ক্রমাগত যুদ্ধ করে বিদ্রোহীদের দমন করেন। তিনি কৌশল করে মোঙ্গলদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করার সম্ভাবনা এড়িয়ে যান **(৪.৭.১ একক দেখো)**। এ ছাড়া তিনি একটি রাজবংশ তৈরি করে যেতে পেরেছিলেন। দিল্লির জনসাধারণের মনে তিনি বংশগত শাসনের একটি ধারণা তৈরি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বংশের শাসকরা তাঁর মৃত্যুর পরেও তিরিশ বছর শাসন করেছিল।

ইলতুৎমিশের সার্থক উত্তরাধিকারী ছিলেন সুলতান রাজিয়া। তাঁর শাসনকাল (১২৩৬-'৪০ খ্রিঃ) দিল্লি সুলতানির ইতিহাসে দু-ভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। প্রথমত, এই প্রথম ও শেষবার একজন নারী দিল্লির মসনদে বসেছিলেন। দ্বিতীয়ত, সুলতান ও তুর্কি অভিজাত অর্থাৎ *চিহলগানি*-র সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক জটিল আকার ধারণ করেছিল।

ইলতুৎমিশের সন্তানদের মধ্যে রাজিয়া ছিলেন যোগ্যতম। একজন নারীর সিংহাসনে বসা নিয়ে অভিজাতদের এক অংশ আপত্তি করেছিল। ইলতুৎমিশের এক ছেলে অল্প দিনের জন্য শাসক হলেও শেষ পর্যন্ত রাজিয়াই ইলতুৎমিশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হতে পেরেছিলেন।

রাজিয়া সিংহাসনে বসেছিলেন সেনাবাহিনী, অভিজাতদের একাংশ ও দিল্লির সাধারণ লোকেদের সমর্থন নিয়ে। উলেমার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও রাজিয়া অ-মুসলিমদের ওপর থেকে জিজিয়া কর তুলে নিয়েছিলেন।

অন্য দিকে, তুর্কি অভিজাতরা মনে করেছিল যে রাজিয়া অ-তুর্কি অভিজাতদের বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এর ফলে দিল্লির বাইরে যেসব তুর্কি অভিজাতরা ছিল তারা গোড়া থেকেই রাজিয়ার বিরোধিতা করতে শুরু করে।

দেশের শাসন চালিয়েছেন এমন আরো কয়েকজন নারী-শাসকের নাম খুঁজে দেখোতো। দরকারে বাড়ির বড়োদের বা শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

টুকরো কথা

সুলতান রাজিয়া

রাজিয়া একজন নারী হলেও তাঁর উপাধি সুলতান, সুলতানা নয়। আরবি ভাষায় সুলতানা শব্দের অর্থ হলো সুলতানের স্ত্রী। কিন্তু, রাজিয়া কোনো সুলতানের স্ত্রী ছিলেন না। রাজিয়া তাঁর মুদ্রায় নিজেকে সুলতান বলে দাবি করেছেন। ওই যুগের একজন ঐতিহাসিক মিনহাজ - ই সিরাজ রাজিয়াকে সুলতান বলেই উল্লেখ করেছেন।

টুকরো কথা

তুর্কান-ই চিহলগানি বা বন্দেগান-ই চিহলগানি

তুর্কান-ই চিহলগানি কথার আক্ষরিক মানে হলো চল্লিশ জন তুর্কি বা চল্লিশটি তুর্কি পরিবার। এরা খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল।

বন্দেগান-ই চিহলগানি কথার মানে হলো চল্লিশ জন বান্দা। বান্দা মানে সেবক বা অনুগামী। এই দুটি কথা দিয়েই ইলতুৎমিশের অনুগত যোদ্ধাদের বোঝানো হতো। নামে তুর্কি হলেও এদের সবাই জাতিগতভাবে তুর্কি ছিল না। সংখ্যার দিক থেকেও তারা চল্লিশ জনের অনেক বেশি ছিল। এরাই ছিল ত্রয়োদশ শতকে সুলতানি শাসনব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ। এদের মধ্যে থেকেই গিয়াসউদ্দিন বলবন পরে সুলতান হয়েছিলেন।

মানচিত্র ৪.১ :
দিল্লি সুলতানি খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

এ ছাড়া রাজপুত শক্তিও তাঁর শাসনের বিরোধী ছিল। রাজিয়া কিছু বিদ্রোহ দমন করলেও মাত্র সাড়ে তিন বছরের বেশি তাঁর শাসন টেকেনি।

৪.৪ সুলতানির বিস্তার ও স্থায়িত্ব দান : গিয়াসউদ্দিন বলবন

১২৪০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান রাজিয়ার মৃত্যু হয়। এরপর কয়েক বছর দিল্লির তুর্কি অভিজাতদের সঙ্গে সুলতান ইলতুৎমিশের বংশধরদের ক্ষমতা দখলের লড়াই চলেছিল। ইলতুৎমিশের ছেলে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১২৪৬-'৬৬খ্রিঃ) একজন তুর্কি আমির ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নাম গিয়াসউদ্দিন বলবন। ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেই সুলতান হন। ইলতুৎমিশের বংশের শাসনের অবসান ঘটে। শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। এরপর থেকে বলবন ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা আরো প্রায় সাড়ে তিন দশক শাসন করেছিলেন।

বলবন এক শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ের দিল্লি সুলতানির প্রধান সমস্যা ছিল ভিতরের বিদ্রোহ। বলবন কঠোর হাতে সেগুলিকে দমন করেছিলেন। রাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য তিনি দরবারে সিজদা ও পাইবস প্রথা চালু করেছিলেন। অভিজাতদের থেকে সুলতানের ক্ষমতা যে বেশি তা বোঝানোর জন্য প্রথাগুলি চালু করা হয়েছিল।

দিল্লি সুলতানিতে যখন এই সব ঘটনা ঘটছে সে সময়টা ছিল ত্রয়োদশ শতক। এই শতকে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে সুলতানি শাসনের ভিত পাকা হয়। সুলতানরা বন কেটে ফেলে, শিকারি ও পশুপালকদের তাড়িয়ে দিয়ে ঐ এলাকাতে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে মজবুত করেছিলেন। তাঁরা কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করেন। তৈরি হয় নতুন নতুন শহর ও দুর্গ।

সুলতানি ও উত্তরাধিকার

সুলতানির প্রধান শাসক হলেন সুলতান। কিন্তু একজন সুলতান মারা গেলে তার পরে কে সিংহাসনে বসবে তা নিয়ে অনেক সময় সমস্যা দেখা দিত। ইলতুৎমিশের (মৃত্যু ১২৩৬খ্রিঃ) পর থেকে আলাউদ্দিন খলজির সিংহাসনে বসার সময়ের (১২৯৬খ্রিঃ) মধ্যে কেটে গিয়েছিল ষাট বছর। এই ষাট বছরে দশ জন সুলতান দিল্লিতে শাসন করেছিলেন। উত্তরাধিকারের কোনো সাধারণ নিয়মনীতি এই সময় ছিল না। এর ফলে ঘন ঘন শাসক বদল হয়েছে। শাসনের ভিত নড়বড়ে হয়ে থেকেছে। বর্তমান সুলতানের সন্তান বা বংশধর পরবর্তী সুলতান হবেন কি না তার কোনো ঠিক ছিল না। অভিজাতরা বিদ্রোহ করে আগের সুলতানের বংশধরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই শাসক হয়ে বসেছে। ত্রয়োদশ শতকের দিল্লি সুলতানিতে এমন ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে।

৪.৫ দাক্ষিণাত্যে সুলতানির বিস্তার : আলাউদ্দিন খলজি

প্রথম দিকের তুর্কি সুলতানদের শাসনকালে উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় অববাহিকায় সুলতানি শাসনের ভিত পাকা হয়েছিল। এরপর সুলতানরা দাক্ষিণাত্যে ক্ষমতা বিস্তারে মন দেন। আলাউদ্দিন খলজি দিল্লির প্রথম সুলতান যিনি দক্ষিণ ভারতে সুলতানি সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুর। (**৪.২ মানচিত্র দেখো**)

টুকরো কথা

সিজদা ও পাইবস

এ দুটি ছিল পারসিক প্রথা। বলবন নিজেকে পারস্যের কিংবদন্তী নায়কের বংশধর ভাবতেন। রাজদরবারে তিনি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান পালন করতেন। সিজদা-র অর্থ হলো সুলতানকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করা। আর সুলতানের পদযুগল চুম্বন করাকে বলা হতো পাইবস। এগুলো ছিল সুলতানের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক।

টুকরো কথা

খলজি বিপ্লব

১২৯০ খ্রিস্টাব্দে জালাল-উদ্দিন ফিরোজ খলজি বলবনের বংশধরদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে সুলতান হন। এই ঘটনাকে 'খলজি বিপ্লব' বলা হয়। এর ফলে দিল্লিতে ইলবারি তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতা চলে যায়। তার বদলে খলজি তুর্কি ও হিন্দুস্তানিদের ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল।

এবারে ভেবে বলোতো উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিশাল এলাকা কীভাবে সুলতানরা শাসন করবেন? এই বিষয়ে জানার জন্য পড়ে দেখো ‘সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ’ অংশটি (*৪.৭.১ থেকে ৪.৭.৩ এককগুলি দেখো*)।

মানচিত্র ৪.২ : আলাউদ্দিন খলজির সামরিক অভিযান

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

উপরের মানচিত্রে কতগুলো স্থানের নাম খুঁজে পেলে? এর মধ্যে কোন কোন স্থানের নাম বর্তমানেও একই আছে তা আজকের ভারতের মানচিত্র দেখে মেলাও। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্য নাও।

৪.৬ দিল্লি সুলতানি : খ্রিস্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে

খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথম কুড়ি বছর খলজি সুলতানরা দিল্লিতে শাসন করেছিলেন। এরপর তুঘলক বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের বড়ো ছেলে মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকাল (১৩২৪-’৫১খ্রিঃ) উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে উত্তর আফ্রিকার মরক্কো দেশের তাঞ্জিয়ার শহরের অধিবাসী ইবন বতুতা এ দেশে এসেছিলেন। তাঁর লেখা ভ্রমণ বিবরণীর নাম *অল-রিহলা*। মহম্মদ বিন তুঘলকের যুগ সম্পর্কে এই গ্রন্থ একটা নির্ভরযোগ্য সূত্র।

টুকরো কথা

ইবন বতুতার বিবরণে ভারত

ইবন বতুতার লেখা থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবরণ

"ভারতে ডাকে চিঠিপত্র পাঠাবার দু-রকম ব্যবস্থা আছে। ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থাকে 'উলাক' বলা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রতি চার মাইল অন্তর ডাকের ঘোড়া রাখা হয়। পায়ে হাঁটা যে-ডাকের ব্যবস্থা আছে তাকে বলা হয় 'দাওআ'। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক মাইলের এক-তৃতীয়াংশে ঘনবসতির একটি গ্রাম থাকে। গ্রামের বাইরে তিনটি তাঁবু থাকে। এই তাঁবুতে ডাকের লোকেরা কোমর বেঁধে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত থাকে। এদের প্রত্যেকের হাতে থাকে দু-হাত লম্বা একটি লাঠি। প্রত্যেক লাঠির মাথায় কয়েকটি তামার ঘণ্টা বাঁধা থাকে। যখন শহর থেকে সংবাদবাহক রওনা হয় তখন তার এক হাতে থাকে চিঠি আর অন্য হাতে থাকে ঘণ্টা-বাঁধা লাঠিটি। এই চিঠি ও লাঠি নিয়ে সে যত দ্রুত সম্ভব দৌড়োতে থাকে। .... দেশে নতুন লোকের আগমন-সংবাদ গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা চিঠি লিখে সুলতানকে জানিয়ে দেয়। সে-চিঠিতে নবাগতের নাম, তার দেহের ও পোশাকাদির বর্ণনা, সঙ্গীদের সংখ্যা, চাকর-বাকর, ঘোড়া ইত্যাদির বিবরণ থাকে। পথে চলার সময় অথবা বিশ্রামের সময় তাদের ব্যবহার কী রকম তা-ও জানানো হয় চিঠিতে।"

মানচিত্র ৪.৩ : ইবন বতুতার ভারত ভ্রমণ

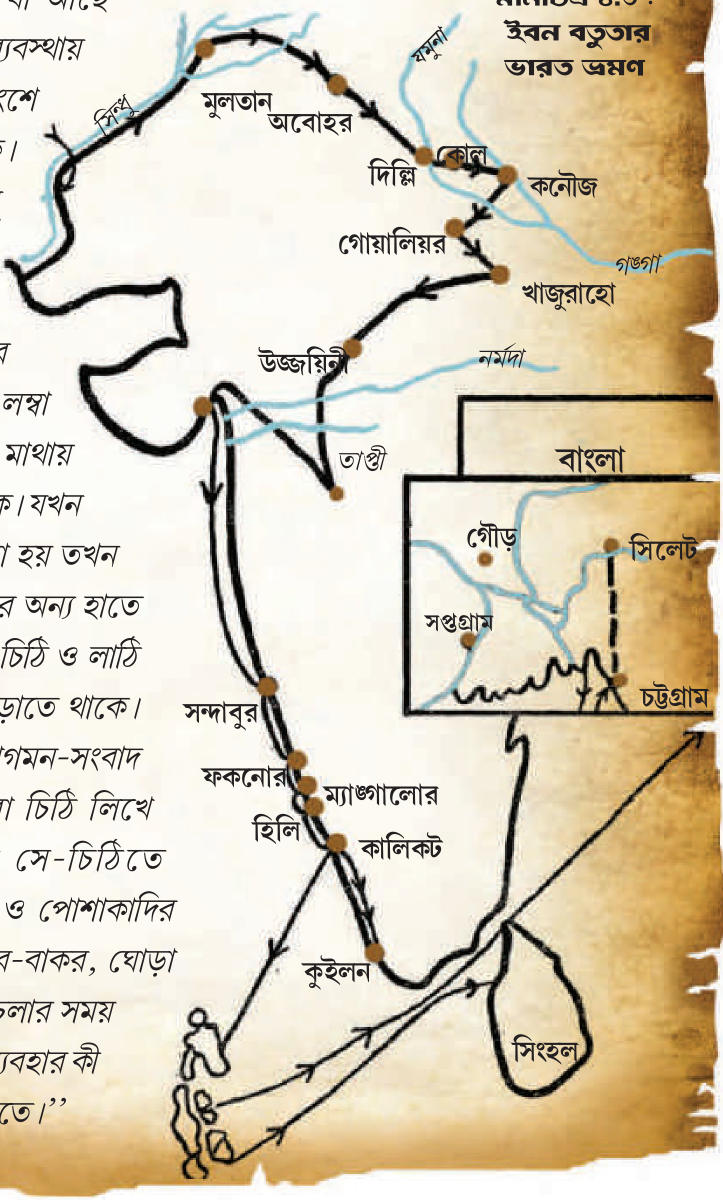

টুকরো কথা

তুঘলকি কাণ্ডকারখানা

আজকের দিনেও কোনো ব্যক্তির খামখেয়ালি আচরণকে বলা হয় তুঘলকি কাণ্ডকারখানা। কারণ মহম্মদ বিন তুঘলককে কেউ কেউ বলেছেন 'পাগলা রাজা'। আর তাঁর কাজকর্মকে বলা হয়েছে তুঘলকি কাণ্ড।

তুমিও কি তাই বলবে? **নীচের অংশটা পড়ে নিজে ভাবো :**

- বাড়তি কর সংগ্রহ করার জন্য দোয়াব অঞ্চলে রাজস্ব বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সুলতান। অনাবৃষ্টির ফলে সেখানে শস্যের ক্ষতি হয়েছিল। প্রজারা বাড়তি কর দিতে পারেনি। তারা বিদ্রোহ করে। সুলতান বাড়তি কর মকুব করেন। নষ্ট হওয়া ফসলের জন্য ক্ষতিপূরণ দেন। কৃষকদের সাহায্য করার জন্য সুলতান *তকাভি* ঋণ দান প্রকল্প চালু করেছিলেন।
- দিল্লির অধিবাসীদের বিরোধিতা এবং মোঙ্গল আক্রমণের ভয় থেকে রক্ষা পেতে ও দাক্ষিণাত্যকে শাসন করতে দেবগিরিতে দ্বিতীয় রাজধানী তৈরি করেন মহম্মদ বিন তুঘলক। ওই শহরের নতুন নাম হয় দৌলতাবাদ। সুলতানের হুকুমে দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে যেতে গিয়ে পথে অনেক মানুষ প্রাণ হারান। কয়েক বছর পরে সুলতান আবার রাজধানী ফিরিয়ে নিয়ে যান দিল্লিতে।
- মূল্যবান ধাতু সোনা এবং রুপোর ঘাটতি মেটাতে তামার মুদ্রা চালু করেন সুলতান। ওই মুদ্রা যাতে

মানচিত্র ৪.৪ :

ভারত (আনুমানিক ১৩৩৫ খ্রিঃ)